সমীর সেনগুপ্ত

কালীকৃষ্ণ গুহ

একজন প্রয়াত বন্ধুর কথা কীভাবে করব ভাবতে ভাবতে অনেকগুলি দিন কেটে গেল। সমীর সেনগুপ্তের চলে যাবার পর (২৩ ডিসেম্বর ২০১১ -এর মধ্যরাত্রি) কত-যে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালাম, কতবার যে ঝরাপাতাদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালাম, কত-যে গান শুনলাম, কত-যে বিকেল হয়ে-আসা দেখলাম, কত পথনাটকের আসরের দৈনন্দিনে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করলাম! 'আমার বন্ধু শক্তি' বইটির শুরুতে সমীর লিখেছিলেন, 'ধরে নিয়েছিলাম শক্তি থাকবে চিরকাল, মানুষকে চিরদিন ভালোবাসবে, পশুপাখিকে ভালোবাসবে, গাছপালাকে ভালোবাসবে। হাসি দিয়ে বুঝিয়ে দেবে, ওর বিরোধ সব শুধু ওর নিজের সঙ্গে, ও পালাতে চায় শুধু নিজের কাছ থেকে— নিজে ছাড়া আর সকলেই ওই বন্ধু। সমস্ত মানুষের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা, অথচ ভিতরে ভিতরে এত সুদূর, এমন মানুষ আর দেখব না। সামাজিকতার সম্পর্ক পার হয়ে, বাক্ ও অর্থের হানাহানি শেষ হবার পর একটা জায়গায় শক্তির মতো নিঃসঙ্গ কেউ ছিল না, অমন অনুপস্থিত মানুষ আর কখনো দেখিনি।' এই কথনের ধারায় মনে হয়েছিল সমীরের বিষয়ে আমার কথাও শরু করতে পারি। আমিও সত্যিই ভেবেছিলাম সমীর সেনগুপ্ত চিরদিন (অর্থাৎ আমার জীবনকাল পর্যন্ত, কেননা তার পরের সময়ের সঙ্গে তো আর কোনও সম্পর্ক থাকবে না!) থাকবেন, মানুষ গাছপালা ও পশুপাখিকে ভালোবাসবেন, জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসার কারণে একজন দার্শনিকের পরিসর অর্জন করবেন। অবশ্য শক্তির মতো নিজের কাছ থেকে পালিয়ে - বেড়ানো 'অনুপস্থিত মানুষ' তিনি ছিলেন না। গত ৫/৬ বছর তাঁকে নিয়মিত দেখে এসেছি—তাঁর সামনে কমপিউটার, ডানদিকে খোলা জানালা। তিনি কমপিউটার থেকে মুখ তুলে খোলা জানালার দিকে তাকিয়ে দেখতেন রোদ্দুরের রং কেমন হলো, চড়াইপাখিগুলি তাঁর ছড়িয়ে-দেওয়া চাল খাচ্ছে কি না (নাকি তাঁর পোষা বেড়ালের ভয়ে দূরত্ব বজায় রেখে আড়চোখে উড়ে উড়ে দেখছে!) আকাশে আজ কতটা মেঘ বা কতখানি নীলের ঘনত্ব— হয়তো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বেছে নিতেন, শূন্যতার শেষ কোথায়। তাঁর ছিল না ঈশ্বরবিশ্বাস, আত্মা-পরমাত্মার ধাঁধা, পূজাপার্বণের বালাই। জ্ঞানচর্চা ও সর্বতোভাবে জীবনের ব্যঞ্জনাগুলি বুঝে নেবার মধ্যেই ছিল তাঁর ধর্মপালন। তাই তাঁর মৃত্যুর পর স্মরণসভার নিমন্ত্রণপত্রে তাঁর স্ত্রী মায়া সেনগুপ্তের চিঠিতে লেখা ছিল এই কথাগুলি, 'তিনি রবীন্দ্রচর্চাসহ সাহিত্যের গবেষণাকাজে দীর্ঘকাল নিমগ্ন থেকে গান শুনে জীবন ও প্রকৃতিকে ভলোবেসে আনন্দের সঙ্গে বসবাস করেছিলেন আমাদের মধ্যে। এই কথা ভেবে আমরা অশ্রুসংবরণের চেষ্টা করছি। বিশ্বপ্রকৃতি ও পার্থিব জীবনেই ছিল তাঁর যাবতীয় আগ্রহ। মানবধর্মের মধ্যেই ছিল তাঁর ধর্মবোধের পরিসীমা। তাঁর নির্দেশ মেনে কোনও পরলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়নি। এই নির্দেশ আমি ও আমাদের কন্যা কুস্‌মি সানন্দে গ্রহণ করেছি।' মায়া—যাঁকে নিরীশ্বর সমীরের সাধনসঙ্গিনী হিসেবে বর্ণনা করতে ইচ্ছে হয়— যা বলেছিলেন ওই চিঠিতে তাতে রয়েছে সমীরের সংক্ষিপ্ততম সত্য পরিচয়, বলা বাহুল্য। তাঁর ধর্মবোধের সঙ্গে নিজের ধর্মবোধ মিলে গেছিল বলেই তাঁর প্রতি আমার আকর্ষণ প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠেছিল। তাঁর কাছে অবশ্য যত বেশি যেতে ইচ্ছে করত তত বেশি যাইনি, কেননা চাইতাম না যে তাঁর মূল্যবান সময় নষ্ট হোক। তাঁর সময় আর ইচ্ছে হলে তাঁর আহ্বান আসত—সপ্তাহে অনন্ত দুবার। সবসময়ই তাঁর ভাণ্ডার থেকে একটি/ দুটি বই আনতাম প্রধানত রবীন্দ্রজিজ্ঞাসার কারণে, যা দিয়ে তিনি আনন্দ পেতেন। একজন জিজ্ঞাসুকে একটি বই পড়তে দেওয়ার মধ্যে যেন মিশে ছিল একজন সহযাত্রীর প্রতি মঙ্গলকামনা। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরবিশ্বাস শেষপর্যন্ত কীভাবে 'চিরজীবন শূন্যখোঁজা'য় পৌঁছেছিল তা আমরা দুজনেই বুঝতে চেষ্টা করছিলাম। আমার প্রস্তাব ছিল, রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতা সম্প্রসারিত হয়ে অন্তহীন বিশ্বপ্রকৃতিতে এসে মিশেছিল প্রকৃত প্রস্তাবে যা ছিল নিরীশ্বর। এই প্রস্তাবনায় তাঁর সমর্থন ছিল বলে এ বিষয়ে লিখতে গিয়ে ভয় পাইনি, যদিও, বলতেই হবে; অমিয় চক্রবর্তীই বোধ হয় সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথের নতুন বিশ্বদৃষ্টির প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

।। দুই ।।

চাকরি থেকে স্বেচ্ছা-অবসর নিয়ে সমীর তাঁর সওদাগরি অফিসের যোগ্য পোশাক প্যান্ট-শার্ট-টাই ছেড়ে ফেলে, বিলিয়ে দিয়ে, পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে পড়তে বসেন একটি স্থায়ী আসনে। সাধারণের পড়াশোনা নয়, একজন গবেষকের পড়াশোনা। বুদ্ধদেব বসুর জীবনী লিখে গুরুঋণ শোধ বা স্বীকার করেন। তার আগেই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অগ্রন্থিত কবিতা সংগ্রহ করে, তাঁর উপর অজস্র নিবন্ধ লিখে গুণমুগ্ধ বন্ধুর কাছ সমাপ্ত করেন আর সেইসঙ্গে বাংলা কবিতার পাঠকের কাছে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে ওঠেন। কিন্তু তাঁর গবেষক-মন ক্রমশ আরও একটি বিপুল আকার ধারণ করে। তিনি রবীন্দ্রচর্চা শুরু করেন এবং বাংলা - সাহিত্যের পাঠককে চিরঋণী করে প্রথমে 'রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়জন' এবং পরে, মৃত্যুর অল্প কিছু আগে, 'রবীন্দ্রসূত্র বিদেশিরা' নামের দুখানি মহাগ্রন্থ রচনা করেন। এই বইদুটির সঙ্গে যাঁদের পরিচয় ঘটেছে তাঁরা জানেন কত শ্রম ও মেধার কাজ তিনি করে গেছেন। আর তার সবটাই করেছেন বিনা পারিশ্রমিকে, শুধু জ্ঞানচর্চার আনন্দে। বেঁচে থাকলে তিনি তাঁর প্রাপ্য সম্মান অবশ্যই পেতেন বলে আমাদের বিশ্বাস, কিন্তু তা হবার ছিল না। এই কথা ভেবে আমাদের কিছু অতিরিক্ত মনস্তাপ হয়। এ যুগের রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ হিসেবে প্রশান্তকুমার পাল ও শঙ্খ ঘোষের পাশেই তাঁর নাম করতে হবে আমাদের। কিন্তু এসব বিচার আপাতত নয়। আপাতত আমরা তাঁর লেখা থেকেই তাঁর জীবনের কথা— তাঁর গড়ে-ওঠার কথা কিছুটা জেনে নিতে পারি।

।। তিন ।।

সমীর ছিলেন একজন যুক্তিবাদী কথা মুক্তচিন্তার মানুষ। আমাদের সমাজে যুক্তিবাদী-তথা মুক্তচিন্তা করার জন্য, আর অবশ্যই তা প্রকাশ করার জন্য, যে সাহস লাগে সমীরের তা ছিল। সমীর সেনগুপ্তের জীবন গড়ে উঠেছিল প্রধানত দুজন ব্যক্তির প্রভাবে— একজন তাঁর চিকিৎসক পিতা শিশিরচন্দ্র অন্যজন তাঁর প্রধানতম শিক্ষাগুরু বুদ্ধদেব বসু। ১৯৫৮ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে তিনি যাদবপুরে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে এম. এ-তে ভর্তি হন। তিনি লিখছেন, 'আমার জীবনদর্শনের মূল ধাঁচটা পেয়েছিলাম আমার বাবার কাছে, যিনি প্রায় যে-কোনও বিষয়ের অন্তত অ আ ক খ - টুকু জানাতেন, চাষ করতে পারতেন, নিজের হাতে বাড়ি বানিয়ে বাস করেছেন। নেফায় তাঁর সংগ্রহের করাত প্লায়ার্গ ব্যাঁদা আর শিরিষ কাগজের সঞ্চয় নষ্ট করেই আমার যন্ত্রপাতির কাজে হাতেখড়ি হয়েছে। আবার রবীন্দ্রনাথের অজস্র কবিতা তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল।' এর পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন 'প্রথম যৌবনে অর্থাৎ উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে বুদ্ধদেব বসুর দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত হবার ফলে আমার নিজের জীবনে বেশ বড়ো ধরনের কিছু দৃষ্টিভঙ্গিগত সংকটেরও উদ্ভব হয়েছিল, কারণ, 'বুদ্ধদেব ছিলেন, যাকে বলা যায় খাঁটি অর্থের গজদন্তমিনারের অধিবাসী মানুষ সাহিত্য ছাড়া কিছুই বুঝতেন না'। তাঁর কাছ থেকে বুদ্ধদেব বসুর কথা আরও একটু শুনে নিতে হবে, 'বু.র-র প্রভাবে বহুদিন পর্যন্ত আমি ছিলুম বিশুদ্ধ স্নব। যত ভালো কথাই কেউ বলুক, সেটা ভালো উচ্চারণে বলা না হলে আমি মন দিয়ে শোনবার যোগ্য বলে ভাবতে পারতুম না, হাস্যকর মনে হত।' আমরা জানি, উচ্চারণের কী ঘনঘটা তৈরি করেছিলেন বুদ্ধদেব তাঁর তোতলামি ও বাঙালত্ব ঢাকবার জন্য। 'তু. সা ও কবিতাভবন' নামের একটি অসাধারণ নিবন্ধে তাঁর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন নিয়ে অসাধারণ প্রতিবেদন আছে যার কথা সবিস্তারে এখানে বলার নয়। আছে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ফাদার ফাঁল ফাদার আঁতোয়ানের কথা নরেশ গুহ আলোকরঞ্জনের কথা, তাঁর অন্যান্য সহপাঠীর কথা— তুলনামূলক সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সংসারের কথা। ফাদার ফাঁল গ্রে স্ট্রিট থেকে যাদবপুরে যেতেন সাইকেল চালিয়ে, পড়াতেন গ্রিক সাহিত্য। আঁতোয়ান পড়াতেন মধ্যযুগ। আর গাইতেন রবীন্দ্রসংগীত; সুধীন্দ্রনাথের মৃতদেহের পাশে তিনি গেয়েছিলেন 'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু' গানটি। তাঁর শিক্ষক অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত সম্পর্কে সমীরের বক্তব্যটি এখানে উদ্ধার করে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে, 'অলোকরঞ্জন পড়াতেন বাংলা সাহিত্য, আমাদের চেয়ে সামান্যই বড়ো ছিলেন। তাঁর ক্লাশে নোট নেব বলে খাতা পেন্সিল বাগিয়ে তৈরি হয়ে থাকতাম, কিন্তু তিনি কথা বলতে আরম্ভ করলে লিখে নেবার কথা ভুলে গিয়ে শুধু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি তাঁর দিকে যখন তিনি কথা বলেন। মনে পড়ছে গত বছর এক সন্ধ্যায় আমাদের আস্তানায় অলোকরঞ্জন এসেছিলেন। সারাক্ষণ তিনিই কথা বললেন আর কবিতা পড়লেন। পাশে নির্বাক শঙ্খ ঘোষ, নির্বাক সমীর সেনগুপ্ত। নির্বাক সভা। শুধু একটি মেয়ে একটি খেয়াল গান গেয়ে সেই সভার আবহ তৈরি করে দিয়েছিল। তারপর থেকে সমীরের সঙ্গে কথাবার্তায় প্রায় আলোকরঞ্জনের কথা উঠত। শক্তির সঙ্গে জীবন কাটানোর বহু আশ্চর্য বিবরণ সমীর রেখে গেছেন, যেকথা আগেই তুলেছি। শক্তির সঙ্গে রামকিংকরের আস্তানায় ঘোর মত্ত অবস্থায় রাত্রি কাটানোর বিবরণটির কথা অনেকেই জানেন। এই বিবরণটি স্পর্শ করতেই হবে। সেই রাত্রিযাপনের শেষভাগে সমীর তৃষ্ণায় কাতর অবস্থায় হঠাৎ জেগে উঠে দেখেছিলেন, 'বাঁদিকে, দরজাটার দিকে পিঠ ফিরিয়ে, আন্দাজ ৩০° কোণ করে একটা টুলের ওপর কিংকরদা বসে আছেন, সম্পূর্ণ নগ্ন। লুঙ্গিটা কোমর থেকে কোথাও খসে পড়ে গেছে, টের পাননি। তাঁর সামনে একটা টুলের ওপর— সেটা টার্ন টবিল ছিল কিনা মনে নেই— বসানো একটা অর্ধসমাপ্ত মাটির ভাস্কর্য। সিলিঙের একটা বাঁশের বরগা থেকে লণ্ঠনটা ঝুলছে। ডান হাতের মুঠোয় গ্রাসের আকারের একটা মাটির তাল। টুলে বসে স্তব্ধ হয়ে কাজটার দিকে তাকিয়ে আছেন রামকিংকর, স্থির। লক্ষ লক্ষ মশা ছেঁকে ধরেছে, তিনি টের পাচ্ছেন বলে মনে হয় না। চোখে একটা অদ্ভুত ফ্যালফেলে ভাবলেশহীন দৃষ্টি— চেয়ে আছেন কিন্তু চর্মচক্ষে কিছু দেখছেন বলে মনে হচ্ছে না। রামকৃষ্ণদেব যাকে বলেছেন যোগীর দৃষ্টি—'।

যাদবপুরে তুলনামূলক সাহিত্যবিভাগ খুলে সাহিত্য পাঠের যে নতুন ধারা তৈরি করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু, তা নিশ্চয় অতুলনীয়। ফরাসি জার্মান বা রাশিয়ান ভাষার প্রধান লেখক-কবিদের রচনা বাংলা - ইংরেজি অনুবাদে বাঙালি কবি-লেখকদের হাতে চলে এল রাতারাতি। বোদলেয়ার র‍্যাঁবো রিলকে হ্যেল্ডারলিন কাফকা কাম্যু দস্তয়ভস্কি রাতারাতি বাঙালি কবিলেখকদের ঘরে চলে এল, অনেকটাই বুদ্ধদেব বসুর সৌজন্যে। এ ব্যাপারে সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দের অবদানও মনে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর অবদান। শঙ্খ ঘোষ ও অলোকরঞ্জনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হলো একটি মহাগ্রন্থ—সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত—এই একই ধারায়—যাকে হয়তো বলা যায় তুলনামূলক সাহিত্য আন্দোলনের ধারা। এই ব্যাপারটি আলোচনা করতে গিয়ে সমীর সুন্দর মন্তব্য করেছেন, 'ক্রমে বাংলায় এই মত প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করল যে সাহিত্য ব্যাপারটা ভাষা থেকে ভাষায় আলাদা আলাদা করা কোনও ব্যাপার নয়, বস্তুত বিশ্বসাহিত্য বৈচিত্রে বহুধাজটিল হয়েও সারস্বত এক ও অবিভাজ্য'।

।। চার ।।

এবার একান্ত ব্যক্তি-মানুষ সমীরকে নিয়ে দু-একটা কথা বলে আমাদের এই দ্রুত-লিখিত প্রতিবেদন শেষ করব। সমীর নাস্তিক ছিলেন, বলেছি। কথাটার কিছু বিস্তার তাঁর ভাষায় শোনা যেতে পারে, 'ঠিক বুঝি না আমি নাস্তিক কিনা। আমি ঈশ্বরে, অলৌকিকে, পরলোকে পুনর্জন্মে, অবতারে, স্বর্গে ও নরকে, আত্মার অবিনশ্বরত্বে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করি। ধর্ম আর সাম্প্রদায়িকতা—শব্দদুটো আমার কাছে একই অর্থ বহন করে। ...আমাকে কেউ প্রসাদ দিতে এলে আমি বলি প্রসাদ ছাড়া কিছুই খাই না, কারণ আমি যা খাই সবই প্রসাদ— তিনি প্রসন্ন হন বলেই খেতে পাই। খাবার আগে যদি ঠাকুরের

কৃতজ্ঞতা জানাতে হয় তাহলে তো প্রত্যেকবার নিশ্বাস নেবার আগে একবার করে প্রণাম করে নেওয়া দরকার। ভালোবাসা থেকে যা কিছু করি সবই তাই তো প্রণাম...অজস্র স্ববিরোধ নিয়ে আমার আমিত্ব তৈরি হয়েছে—সেই আপতিক বিরোধগুলির অন্তর্লীন সামঞ্জস্যের সুরটি খুঁজে পাবার চেষ্টা করে যাওয়ার নামই পূজা।' 'নাস্তিকের ধর্মজিজ্ঞাসা' নিবন্ধে সমীর শেষ স্তবকে যা বলেছেন তা কিছুতেই এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। বলেছেন, 'আমি নাস্তিক হতে পারি, কিন্তু অধার্মিক নই। আমি মানুষের ধর্মে বিশ্বাস করি। ভালোবাসায় বিশ্বাস করি, মানুষের শুভবুদ্ধির উপর আস্থা রাখায় বিশ্বাস করি। বরং মানুষকে বিশ্বাস করে ঠকতে রাজি আছি, কিন্তু অবিশ্বাস করে মনের শক্তি নষ্ট করতে রাজি নই। ঈশ্বরের মঙ্গলময়ত্বে বিশ্বাস করি না, কিন্তু সর্বজীবের মঙ্গলকামনায় বিশ্বাস করি, মানুষের চিরকাল ধরে হয়ে ওঠায় বিশ্বাস করি। স্বপ্ন দেখি এমন এক পাসপোর্টহীন পৃথিবীর, যেখানে কোনো শিশুকে পেটে খিদে নিয়ে ঘুমোতে যেতে হয় না।' আমাদের হাতের কাছে রয়েছে সমীরের 'অমল, আমার সময়?' নামের বইটি যা অনেকগুলি নিবন্ধের তারকাখচিত একখণ্ড আকাশের মতো একটি সংকলন, যেখানে সমীরের যৌবনের কথার পাশাপাশি পাওয়া যায় তাঁর পরিণত বয়সের নানা উপলব্ধির কথা—যেখানে দেখা যায় একজন যৌবনের স্নবের বহু আগেই উত্তরণ ঘটে গেছে একটা দার্শনিক পরিসরের সরলতায়, চর্যায়।

'দিন যায়' নামের নিবন্ধে সমীর লেখেন, 'সাধারণভাবে আমার যেটুকু চোখে পড়ে, হিংসা এড়িয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়, সমস্ত জীবজগৎ হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত; খাদ্যশৃঙ্খল অর্থই হিংসা, আমি প্রতিবার নিশ্বাস নিলে অজস্র প্রাণী নিহত হচ্ছে। সমস্ত জগতে, যতদূর বোঝা যায়, মানুষের মনে ছাড়া ন্যায়বোধ সৌন্দর্যবোধ ভালোবাসা বিবেক নামক বৃত্তিগুলির কোনো অস্তিত্ব নেই কোথাও। তা-ই যদি হবে, তা হলে সমস্ত মানবসভ্যতার এক দার্শনিক চিন্তা কোন উদ্দেশ্য সাধন করছে?... তাই কোনো কথা ভাবতে যাওয়া, কোনো তর্কের মধ্যে প্রবেশ করা অর্থহীন মনে হয়। আমি শুধু জানালায় বসে থাকি, পাখি দেখি, পোকামাকড় দেখি, রাস্তার কুকুরদের দেখি। ওই যে সুন্দর শালিকটি পোকা ধরে ধরে খাচ্ছে, কল্পনা করতে পারি, আমার কাছে ডাইনোসর যেমন বীভৎস মৃত্যুর প্রতীক পোকাদের কাছে ওই শালিকটিও কী তেমনই। কিন্তু তা জেনে আমার কী হবে, পূর্ণ সত্যে তো আমার অধিকার নেই, খণ্ড সত্যের বাইরে আর কিছু জানবার এখতিয়ারও নেই আমার। পোকারা শালিকটিকে কী চোখে দেখে তা জেনে আমার কী হবে, আমার চোখের সামনে রোদজ্বলা শিশিরভেজা ঘাসের ওপর শালিকেরা নেচে নেচে বেঁচে চলেছে। এই কি আমার পক্ষে যথেষ্ট নয়?'

বোঝা যায় একটা দর্শন-পরিসরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন তুলছেন সমীর, যা ছিল হয়তো তাঁর জীবনে তোলা শেষ প্রশ্ন, শেষ উত্তর, যাঁর কাছে গীতাপাঠের সমাধান ছিল না; শুধু বুলি আওড়ে-যাওয়ার কোনও সমাধান ছিল না। এই অন্তহীন স্থানকালের পরিসরে, বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মের অনিবার্য আর নিরপেক্ষ একটা অন্ধত্বের মধ্যে বসবাস করে জীবন অতিবাহিত করাই শেষ কথা। এই অসহায়তাকে প্রসন্ন মনে মেনে নেওয়ার মধ্যেই যুক্তিবাদীর মুক্তি, সমীরের মতো প্রজ্ঞাবানের মুক্তি।

।।পাঁচ।।

সমীরের মৃত্যুর পর আমাদের বার্ধক্যের স্থবির ও বহু-প্রতীক্ষিত জিনপানের আসরটি ভেঙে গেল। এই ভেঙে -যাওয়া আসরের সামনে দাড়িয়েও বলতে হবে, সমীরের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ও বোঝাপড়ার মধ্যে কোনও তির্যকতা ছিল না, এ ভেবে যে আমি যথেষ্ট বুদ্ধদেব বসু পড়িনি। ঠিকই। তবু আমি ভাবতাম, তাঁর প্রবন্ধ তো প্রায় সবই পড়েছি, নাটকগুলি এবং কবিতাও তো পড়েছি অনেক। কিন্তু আমার মধ্যে এমন উচ্ছ্বাস তৈরি হয়নি যা বুদ্ধদেব বসুকে নিয়ে সমীরের মূল্যায়নের উত্তুঙ্গ স্তরে গিয়ে মিশে যেতে পারে। বস্তুত এ বিষয়ে আমরা নীরবতাই পালন করেছি শেষ পর্যন্ত। বলিনি, যে বুদ্ধদেব বসু যে মধুসূদন পড়াতে দিতেন না তা ছিল একটা জমিদারি স্বৈরাচার। অন্য বিষয়টি ছিল সংগীতে বিশেষত রবীন্দ্রসংগীতে আমাদের রসাস্বাদনের ক্ষেত্রে। সমীর যে রবীন্দ্রসংগীতের ভাণ্ডার গড়ে তুলেছিলেন তা ছিল সত্যিই অতুলনীয়। তিনি নিজেও একসময় গান গাইতেন অর্গান বাজিয়ে। যৌবনে কিছুদিন বেহালাও শিখেছিলেন। তাঁর ভাণ্ডার থেকে কত-যে গান উপহার হিসেবে পেয়েছি, তা ভাবলে আজ মন কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে। তিনি চাইতেন গান হবে উদাও, খোলা-গলায় গাওয়া বড়ো আওয়াজে, যেমন শক্তি গাইতেন। আমি চাইতাম, সেই খোলা-গলার উদাও গান যেন নিমগ্নতা না হারায়, ভিতরের কান্নাটি না-হারিয়ে ফেলে; তা যেন শ্রোতার উপস্থিতির বাইরে দাঁড়িয়ে গায়কের নিজের আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হয়। আসলে এ বিষয়ে আমাদের মধুর মতপার্থক্য ছিল শধু ঝোঁকের প্রশ্নে। ফলে তিনি যেমন দেবব্রত বিশ্বাসের গান ঘন্টার পর ঘন্টা শুনতে রাজি ছিলেন তেমন আমি ঘন্টার পর ঘন্টা সুবিনয় রায় শুনতে রাজি।

এই কথাগুলি শুধু বলার জন্যই বলা, যেহেতু আমাকে নতুন করে, নিজের মতো করে, তাঁকে বুঝতে হবে। মুগ্ধতার দায় থেকেই এই বুঝতে চাওয়া। তিনি যে কাজ রেখে গেলেন তা দীর্ঘস্থায়ী হবে বলেই আমার বিশ্বাস। 'চিরস্থায়ী' লিখতে গিয়ে 'দীর্ঘস্থায়ী' লিখলাম, যেহেতু চিরস্থায়ী শব্দটি বালকোচিত। তাঁর নাম লক্ষ লক্ষ বার শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হবে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে। এই বিশ্বাস নিয়ে শুনতে পাচ্ছি সুবিনয় রায়ের কণ্ঠ: এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে মুকুলগুলি ঝরে। বসন্তকাল। দিনের আলো নিভে আসছে।